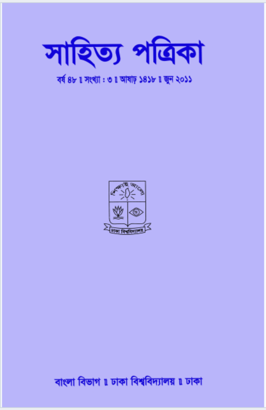

Vol. 48 | No. 3 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের গীতি-নৃত্যনাট্য : আধুনিক সংগীতের সূচনা

Volume	48
Issue	3
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Sayeem Rana
Published online	June 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v48i3.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v48i3.10
Pages	১৭১-১৮০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ ৪৮, সংখ্যা : ৩ ॥ আষাঢ় ১৪১৮ ॥ জুন ২০১১

রবীন্দ্রনাথের গীতি-নৃত্যনাট্য : আধুনিক সংগীতের সূচনা

Check for updates

সাইম রানা*

প্রত্যেক জীবন্ত সত্তা তার আপন অস্তিত্বের দ্যুতি ছড়িয়ে বিকশিত হতে চায়। প্রকৃতি অবশ্য স্বাধীনতার এমন সূত্রকে সবসময় সমর্থন করে না। তাই কেউ কারুর মুখাপেক্ষী অথবা কারুর প্রতি কেউ বিমুখ — এই ধর্ম শাসন করে বা আধিপত্যের মেজাজ নিয়েই প্রকৃতি নিজের ভারসাম্য রক্ষা করে; শিল্প-সংস্কৃতির ধরনেও এমন বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ভারতীয় সংগীতে গীত-বাদ্য-নৃত্য একে অন্যের অনুগামী ছিল, এখন প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র শিল্পসত্তা। প্রাচীন নাট্যরীতি যেমন গীতি ও সুরলীলায় আচ্ছাদিত ছিল, আধুনিক নাটকে এসে সেই আসন দখল করেছে গদ্য-সংলাপের আহ্লাদ। আবার কোনো কোনো নাট্যধারা এমনও হয়েছে যে, সুরে লীলায়িত হতে হতে তার স্বকীয় অভিনয়রীতিই হারিয়ে ফেলেছে, যেমন ইউরোপীয় 'অপেরা'। শিল্পের এই নিয়তি সভ্যতা ও প্রকৃতির বিবর্তনের ওপর বা একে অপরের আধিপত্যের ওপর নির্ভরশীল।

প্রকৃতির নিয়মেই মাঝে মাঝে এমন সব বিস্ময়কর প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে যে, পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ধারা-ধারণাকে তা ভেঙেচুরে নতুন যুগের সূচনা করে। আধুনিক নাট্যগীতির আসরে ইউরোপে রিচার্ড হ্বাগনার (১৮১৩-১৮৮৩) এবং ভারতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) তেমনই দুই মহীরুহ। উভয়েই প্রচলিত ধারার সংস্কার সাধন করতে গিয়ে নতুন শিল্পরূপের সূচনা করেন। হ্বাগনার অপেরাকে গীতি-আধিক্য থেকে মুক্ত করে তাকে সাংগীতিক-নাট্যে (Musical Drama) রূপান্তর করেন, যা ইউরোপীয় নাট্যজগৎকে করেছে গৌরবান্বিত; আর প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথ নাটক করতে গিয়ে সংগীতের মিশ্রণে অভিনব প্রয়োগ দেখিয়ে পক্ষান্তরে সংগীত জগৎকে নতুন দিগন্তে উন্মোচিত করেন।

যে সকল বিষয় আধুনিক সংগীতকে আলাদারূপে চিনতে শিখিয়েছে, তার প্রেক্ষাপট সবসময় রচয়িতার বিষয় নির্বাচনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভা দিয়েই বিশেষায়িত হয় নি; নতুন কোনো শিল্পমাধ্যমের সাথে বোঝাপড়া করতে গিয়ে হয়তো বেরিয়ে এসেছে ফর্মের নতুনত্ব, উঁকি দিয়েছে বিশেষত্ব; পরবর্তীকালে তা সুদীর্ঘ চর্চায় ব্যাপ্ত ও বিকশিত হয়েছে। যেমন চলচ্চিত্র; শতবর্ষ আগে মাধ্যমটির অঙ্কুরোদগম হলো মাত্র। অথচ ক্রমবিকাশের পথে তার নিজস্ব ভাষা নির্মিত হতে গিয়ে সেখান থেকে আরও বেশকিছু শাখা-প্রশাখা বের হয়ে এখন নতুন শিল্পমাধ্যম হিসেবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। আধুনিক গানও এক অর্থে চলচ্চিত্রেরই বাইপ্রোডাক্ট — অবশ্য এটা সর্বজনস্বীকৃত নয়।

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যচর্চার প্রকৃতি থেকেও বেরিয়ে এসেছে নতুন শিল্পাঙ্গিক। 'ভাঙা-গান', 'ঋতুভিত্তিক গান', 'পূজাপর্বের গান', 'প্রেমপর্যায়ের গান', 'ডাকাত দলের উন্মত্ত সুরের গান' ইত্যাদি স্বমহিমায় রবীন্দ্রসংগীত নামধারণ করে চিত্রিত হয়েছে। এখন গীতিনাট্য ছাড়াও

* খণ্ডকালীন শিক্ষক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তা থেকে নেয়া যে কোনো একটি গান বা গানের অংশবিশেষ গেয়েও পূর্ণ অনুভূতির প্রকাশ ঘটানো যায়। পূর্বকালের গানেও যে এরকম দু'চারলাইন গাওয়ার প্রবণতা ছিল না — তা বলছি না; বা থাকলেও, তা বৃহৎ কোনো বিষয়ের অংশ হিসেবেই চিহ্নিত হতো, যেমন মধ্যযুগের 'গীতনাট' বা 'নাটগীত'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'গীতিনাট্য' ও 'নৃত্যনাট্যে'র নির্মাণ পদ্ধতিতেই ভিন্ন বোধ কাজ করেছিল, যা 'যাত্রা' 'নাটগীতে'র মতোও মনে হচ্ছিল না, আবার পাশ্চাত্যের 'অপেরা'র মতোও না। এককথায় যাকে বলতে পারি, পরিমিতিসম্পন্ন রাবীন্দ্রিক ধাঁচ — যেখানে নাট্যের ভেতরে লেজসর্বস্ব হয়ে থাকা গানও নানা ভাব-ভঙ্গিমায় রাবীন্দ্রিক ধাঁচের হয়ে উঠেছিল। এজন্য তাঁকে বাংলায় আধুনিক গীতিনাট্যের স্রষ্টা বলা যেতে পারে। আর 'নৃত্যনাট্য' সম্পর্কে যদি শান্তিদেব ঘোষের ভাষায় বলি, 'গীতনাট্যকে নৃত্যাভিনয়ের সাহায্যে আরো চিত্তাকর্ষক করার একান্ত আগ্রহ থেকেই এই প্রকার (চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ইত্যাদি) নৃত্যনাট্যের উৎপত্তি'; তাহলে এখানেও তাঁর প্রতি উপর্যুক্ত বিশেষণ প্রাপ্য।

কবিতা ও গান আলাদা শিল্পমাধ্যম হয়ে যাবার পর বাংলাগান যে একই মনোটনিক পথে রীতিবদ্ধ ছিল, তা থেকে মুক্তির তাড়না রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জেগে উঠেছিল তরুণ বয়সেই। গীতিনাট্যের ধারণা যেখান থেকেই পেয়ে থাকুন না কেন, অভিনবত্ব প্রকাশের জন্য তিনি বিদেশি সুর সংযোজন করেন নি — বরং ভারতীয় সংগীতের সুরলীলায় রস প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা ও নাটকীয়তার অভাব লক্ষ করেছিলেন বলেই এই ধরনের সৃষ্টির অবতারণা। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয় :

> আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে উল্লাসের সুর নাই। আমাদের সংগীতের ভাবই — ক্রমে ক্রমে উত্থান বা ক্রমে ক্রমে পতন [Chromatic]। সহসা উত্থান বা সহসা পতন নাই। উচ্ছ্বাসময় উল্লাসের সুরই অত্যন্ত সহসা। আমরা সহসা হাসিয়া উঠি, কোথা হইতে আরম্ভ করি কোথায় শেষ করি তাহার ঠিকানা নাই, রোদনের ন্যায় তাহা ক্রমশ মিলাইয়া আসে না। এরূপ ঘোরতর উল্লাসের সুর ইংরাজি রাগিণীতে আছে, আমাদের রাগিণীতে নাই বলিলেও হয়।[১]

তবে এখন যেমন উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে যে অপেরা বা ব্যালে আঙ্গিকের শিল্পধারা এদেশের গ্রামীণ জনপদে প্রাচীনকাল থেকেই পরিবেশিত হয়ে আসছে, তা না অনুসন্ধান করে বরং যাত্রা, শোভাযাত্রাকেই অপেরার বাঙালি আঙ্গিক হিসেবে দেখেছেন গবেষকগণ। ফলে রবীন্দ্রনাথের *বাল্মীকিপ্রতিভার* পূর্বে যে পশ্চিমা অভিজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের *মানময়ী* (১৮৮০), দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর *বসন্ত উৎসব* (১৮৭৯), কিংবা ১৮৬৫ থেকে ১৮৮১ পর্যন্ত কলকাতার মঞ্চে পঞ্চাশটি গীতিনাট্যের সন্ধান প্রাপ্তির[২] সংবাদটিকেই মুখ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল, সেই বিবেচনায় গীতিনাট্যের ইতিহাসকে অপেরা থেকে আমদানিকৃত মনে করা গবেষক মহলের ইতিহাস অন্বেষার সীমাবদ্ধতা বলে ধরে নেয়া অমূলক নয়।

গীতিনাট্যকে অপেরা বলা হলেও অপেরার সাথে ভারতীয় গীতি-নির্ভর নাট্যধারার ঐতিহাসিক গড়মিল রয়েছে এবং বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যও রয়েছে ঢের, যেসব নাট্যধারা নিজস্ব নামে বিশেষ প্রকরণশৈলীতে বিকশিত হয়েছে। অপেরার অভ্যুদয় ব্যারোক যুগে অর্থাৎ ১৫৭৫ সালের দিকে ইটালি শহরে। রজার ক্যামেইন-এর মতে :

> Opera was born in Italy. Its way was prepared by musical discussions among a small group of nobles, poets and composed who began to meet regularly in Florence around 1575. This group was known as the Camereta (Italian for fellowship or society) and included the composer Vincenzo Galilei, father of the astronomer Galileo.[৩]

গীতিনাট্যের ভারতীয় ধারা বিচার করলে উনিশ শতকের প্রচলিত 'যাত্রা' দলের নামে প্রথাগতভাবে অপেরা নামটি পাওয়া যায়, যেমন 'পাষাণময়ী অপেরা', 'রণজিৎ অপেরা' 'ভোলানাথ অপেরা' ইত্যাদি। এ সমস্ত দলের নামে 'অপেরা' থাকলেও কর্মকাণ্ডে ইউরোপীয় অপেরা পরিবেশনার সঙ্গে কোনো মিল নেই বললেই চলে। তবে ১৮৬৮-৬৯ সালে কলকাতায় বিদেশি ইটালীয় অপেরা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ও তাদের অভিনয়রীতির যে সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে গীতিনাট্য বলতে যদি সুরবহুল অভিনয়রীতি নির্দেশিত হয়ে থাকে, তাহলে দেখা যাবে, ভারতীয় নাট্যের ইতিহাস থেকে এই ধারা কিছুটা বিচ্যুত হয়েছে। অবশ্য যাত্রা বা নাট্যনির্ভর গীতির ইতিহাসও এদেশে সুপ্রাচীন। বাংলা নাট্যধারায় 'নাটগীত' এবং 'গীতনাট'-এর প্রচলন প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে বিকশিত হয়েছে, যা বিভিন্ন পরিবেশনারীতি যেমন নাথগীতি, মঙ্গলকাব্য, পাঁচালি, পালাগান ইত্যাদি আখ্যান ও লীলানাট্যের মধ্যে পাওয়া যায়।

ফয়জুল্লা রচিত *গোরক্ষবিজয়*-এ সংগীত, বাদ্য, নৃত্য ও নাটকের উল্লেখ আছে। যেমন :

> নাট কর নাটুয়া তাল বাহ ছলে।
> তোহ্মার মাদলে কেন গুরু গুরু বোলে ॥

মধ্যযুগের পাঁচালি *শূন্যপুরাণ*-এ 'নাটগীত' সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> নাটগীত করে গতি এচারি চৌপররাতি
> তামর অঙ্গুরী লইয়া করে ॥

*পদ্মাবতী*তে 'গীতনাট' সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> পিছল সৌরভ পঙ্ক হৈল হাটে বাট
> যথাতথা রঙ্গরস দেখি গীতনাট ॥

নাট্যকার সেলিম আল দীন এ সম্পর্কে বলেন :

> গীতনাট সচরাচর কৃত্যপাঁচালী যথা ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি। তবে এ কথাও ঠিক যে, মধ্যযুগের পাঁচালিকারগণ কখনো কখনো গীত-নৃত্যকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানকে সাধারণভাবে 'গীতনাট' বা 'নাটগীত'রূপে আখ্যায়িত করেছেন।[৪]

রবীন্দ্রসৃষ্ট গীতিনাট্য চরিত্রগত বিচারে নাটগীত বা গীতনাটের সাথে সুসম্পর্কিত থাকলেও এদের মধ্যে পরিবেশনায় মিল পাওয়া যায় না। নাটগীত ও গীতনাটের মঞ্চ, অভিনয়, সময় পরিসর, দর্শকের শ্রেণিগত অবস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে অমিল লক্ষণীয়। এ কারণেই বলা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক গীতিনাট্যের স্রষ্টা, একই অর্থে নৃত্যনাট্যের জনক।

ভারতীয় গীতিনাট্যের বৈশিষ্ট্য বীক্ষণ করে রাবীন্দ্রিক নাট্যধারার যে আংশিক মিল পাওয়া যায়, তা নির্দিষ্ট করেছেন শান্তিদেব ঘোষ। তিনি বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্য-নিদর্শনে প্রধানত চার ধরনের স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন। প্রথমত : কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে যাত্রাভিনয়ের মতো পাত্র-পাত্রীদের গান করা। দ্বিতীয়ত : সূত্রধর কর্তৃক নাটকের বক্তব্য ও ধারাবর্ণনা এবং পাত্রপাত্রীদের শুধুমাত্র অভিনয় প্রদর্শন, যেমন — প্রাচীন যাত্রাগান 'কালীয়দমন'। তৃতীয়ত : একই ভাবসূত্রে গাঁথা অনেকগুলো গানের নাটকীয় রূপ। চতুর্থ বিষয়টি হলো, নাটকের পুরোটাই গানে ও সুরে প্রদর্শিত — শেষোক্ত শ্রেণির সাথে ইউরোপীয় অপেরার সাদৃশ্য রয়েছে।

রবীন্দ্রনাট্যে উপর্যুক্ত প্রায় সব ধারার সন্ধান ও মিল পাওয়া যায়। সে সম্পর্কে শান্তিদেব ঘোষ আরো বলেন :

> গুরুদেব সব-সমেত ছয় রকমের [জীবনের বিভিন্ন সময়] গীতনাট্য [নৃত্যনাট্যসহ] রচনা করেছিলেন, যেমন প্রথম দলে হল 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা'। দ্বিতীয় দলে হল 'অচলায়তন', 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী', 'অরূপরতন' ও 'তাসের দেশ'। 'বসন্ত', 'শ্রাবণগাথা' হল তৃতীয় দলের। 'ঋতুরঙ্গ', 'সুন্দর' ও 'নবীন' হল চতুর্থ দলের গীতনাট্য। পঞ্চম দলে 'শিশুতীর্থ' ও 'শাপমোচন'। আর শেষ অথবা ষষ্ঠ দলের গীতনাট্য হল 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা' ও 'চণ্ডালিকা'।[৫]

প্রথম পর্যায়ের গীতিনাট্যগুলো চতুর্থ দলভুক্ত, অপেরার সাথে এর কিছুটা মিল পাওয়া যায়। *শারদোৎসব, ফাল্গুনী, অচলায়তন, তাসের দেশ* প্রভৃতি প্রথম পর্যায়ের গীতিনাট্যগুলোতে যাত্রাভিনয়ের মতো না হলেও গানের ফাঁকে ফাঁকে কথাবার্তার প্রয়োগ রয়েছে। *শাপমোচন* ও *শিশুতীর্থ* দ্বিতীয় পর্যায়ের বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ এতে সূত্রধর ঘটনার বিষয়বস্তুকে দর্শকের সামনে তুলে ধরে আর পাত্রপাত্রীরা শুধু অভিনয় করে। *বসন্ত, ঋতুরঙ্গ, নবীন* ও *শ্রাবণগাথা* তৃতীয় দলের অর্থাৎ এতে গানগুলোই প্রধান, তবে তা একটি মূলভাবসূত্রে গাঁথা। গল্পের জন্য নাটক না হয়ে, গানগুলিকে সাজিয়ে নাট্যরূপ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্য অপেরার অনেক আগেই ভারতীয় গীতনাটের প্রচলন ছিল। ফলে এ কথা প্রমাণিত হয়, নাট্য-নিদর্শনে এদেশের সংস্কৃতি অনেক সমৃদ্ধ এবং নাট্যসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ পূর্ব-পশ্চিম উভয় ধারারই আশীর্বাদপুষ্ট।

গীতিনাট্যের ইতিহাস নিয়ে যে বিতর্কই থাকুক না কেন, রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য সৃষ্টির সূচনালগ্নে ইউরোপীয় সংস্কৃতির ঢলে ভেসে চলেছিল ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতি এবং তৎকালীন কলকাতার বাবুসমাজ; অবশ্য সাধারণ নাটকের তুলনায় তা ছিল আকর্ষণীয়। এর জনপ্রিয়তাও ছিল অনেক বেশি, কারণ এই নাটকসমূহে অপেরার সার্থক প্রকাশ না থাকলেও মিশ্রণ করার সচেতন প্রয়াস ছিল। পূর্বে উল্লিখিত প্রণয়কুমার কুণ্ডু কর্তৃক ১৫ বছরে (১৮৬৫-১৮৮০) ৫০টি গীতিনাট্য[৬] পরিবেশনের তথ্য প্রদানের সূত্রেই তা জানা যায়।

গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন পালা, পাঁচালি, আখড়াই, কীর্তন, জারি, কবিগানের সঙ্গে তরুণ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় তখনও আন্তঃসম্পর্ক শুরু হয় নি। হয়তো উঁচুতলার

শিল্পের মধ্যে এসব পরিবেশনার সাদৃশ্যসমূহ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় নি তাঁর। একথা সত্য যে, সে আমলের পশ্চিমাঘেঁষা গীতিনাট্যচর্চা এদেশের সংগীত পরিমণ্ডলে সমৃদ্ধতার ছাপ এনেছিল, রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে তা বিশিষ্টতায় রূপ নেয়।

রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে গিয়ে যে সরাসরি অপেরা দেখেছিলেন তা অনুমান করা যায়। বিশেষ করে অপেরার আধুনিক দ্রষ্টা জার্মান সুরকার রিচার্ড হ্বাগনারের সাথে রবীন্দ্রনাথের ভাবগত ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায় গীতিনাট্যের বৈশিষ্ট্যানুসন্ধানে। হ্বাগনার 'অপেরা'কে 'মিউজিক্যাল-ড্রামা'য় রূপান্তর করেন; অপেরার অবক্ষয় থেকে মুক্তির জন্য সুরময় আবিষ্টতা থেকে বা মন্ত্রমুগ্ধতা থেকে মুক্ত করে তাতে বরং অভিনয়-কলার সংলাপ-শৈলীর অর্থ আনার চেষ্টা করেন। এদিকে রবীন্দ্রনাথও পাঁচালি, পালার পথে না পা বাড়িয়ে স্বতন্ত্র নাট্যচিন্তা প্রয়োগ করেন। ১৮৮১ সালে *বাল্মীকিপ্রতিভা* রচনাকালে দেখা যায়, সংগীতের মধ্যে গায়কীর সুললিত সুরের আধিক্য বর্জন করে, তিনি অভিনয়ধর্মী নাটকীয় আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন :

> বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা। — অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার স্বাদ গ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকিপ্রতিভা তাহা নহে — ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্য বিষয়টা সুর করিয়া অভিনয় হয় মাত্র — স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে।[৭]

এই বক্তব্য থেকে অপেরার প্রচলিত রূপ এবং তা থেকে হ্বাগনারের মিউজিক্যাল ড্রামার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট ধারণা ছিল, তা প্রমাণিত হয়। সুরের ভিতর দিয়ে নাটকীয়তা সৃষ্টির ব্যাপারে ইউরোপীয় সংগীতের যে সুবিধাজনক অবস্থান সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোনো সংশয় ছিল না। কিন্তু অপেরা গায়কীতে যে নানামাত্রিকতা বা অর্কেস্ট্রা দলের নিয়ম-রীতি রক্ষার বিশেষত্ব রয়েছে[৮] সেগুলো আবার অভিনয়রীতিতে তিনি রাখেন নি। বরং ভারতীয় গীতশৈলী ও বাদনপদ্ধতিতেই তা প্রয়োগ করেছেন। অন্যদিকে ভারতীয় গীতিনাট্যের ধারায় যে নৃত্য প্রচলন অভিনয়রীতির প্রকাশকে ফলপ্রসূ করে এসেছে, সেই বিষয়টিও প্রথম জীবনের গীতনাট্যে অনুপস্থিত। জীবনের শেষকালের নৃত্যনাট্যগুলোতে অবশ্য সেই অপূর্ণতাও রাখেন নি। সর্বোপরি ছকে বাঁধা অপেরার যন্ত্রসৌকর্য বা কণ্ঠশীলনের কৌশল তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। কারণ স্বদেশীয় ধারাকে আঞ্চলিক অবকাঠামো থেকে উঠিয়ে এনে বিশ্বজনীন করাই বরং তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

অপেরার মতো আমাদের সাহিত্যে ও সংগীতে গীতিনাট্যের একটা নিজস্ব ভুবন গড়ে ওঠে নি। সাংগীতিক প্রেরণা থেকে যে ইউরোপীয় অপেরার জন্ম, তেমন সাংগীতিক প্রেরণা আমাদের গীতিনাট্যকারদের মধ্যে আদৌ ছিল কি না, সন্দেহ, অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ছাড়া। য়ুরোপীয় সংগীতের ইতিহাসে যেমন অপেরা সংগীতের একটা বিশিষ্টতা ও বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, আমাদের সংগীতে সেই জাতীয় কোনো ভূমিকাই নেই এই সব গীতিনাট্যের।[৯]

উপর্যুক্ত বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ না করার মতো অজস্র উদাহরণ বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চায় এখনও বিদ্যমান। উনিশ শতকে কলকাতায় উচ্চশ্রেণিবর্গের কাছে

ইউরোপীয় ধারার বিকাশ ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু তাকে বাঙালির সার্বিক শিল্পচর্চার মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা ভুল হবে। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে যখন বাউল ও কীর্তন ধারায় আকৃষ্ট হলেন, তখন কৈশোরের মতাদর্শ থেকে ধীরে ধীরে সরে এলেন। বাংলা লোকসংস্কৃতির ধারায় শত-সহস্র বছর ধরে যে কত নাট্যধারা প্রবাহিত-পরিবেশিত হয়ে আসছে গ্রামে-গ্রামাঞ্চলে, তার হিসাব মেলানো কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। অপেরা নামধারী পেশাদারী যাত্রাদলের ন্যায় তা হয়তো চোখে পড়ার মতো নয়। তবে ঝুমুরযাত্রা, ঢাকযাত্রা, গম্ভীরা-যাত্রা, আলকাপগান, কিচ্ছাগান, কুষাণগান, পালাগান ইত্যাদির মধ্যে গীতিনাট্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে পাওয়া যায়। শোভাযাত্রা বা যাত্রাকে যদি অপেরা বলা হয়, তবে তার সূচনা দ্রাবিড় সভ্যতায়। বৈদিক যুগ হয়ে জয়দেবের *গীতগোবিন্দে* এসে তা পূর্ণপ্রকাশিত হয়েছে। আর নাট্যধারার সাথে মিল খুঁজতে গেলে ১২০০ বছরের প্রাচীন চর্যাগীতিকেও গীতিনাট্যের দলে আশ্রয় দেয়া যায়। বীণাপানাম্ রচিত ১৭ সংখ্যক পদে যেমন বলা হয়েছে :

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই॥

এর অর্থ হলো বজ্রাচার্য নৃত্য করেন, তার সাথে দেবী করেন গান, এবং এভাবে বুদ্ধ নাটক সম্পন্ন হয়।

তবে ইউরোপের অপেরার সাথে রাবীন্দ্রিক অপেরার সম্পর্ক বাংলার নিজস্ব নাট্যরীতি অপেক্ষা কিছুটা দূরে। যেমন, তিনি সুর ব্যবহারে রাগ-রাগিণীর সুরকে মুখ্য করেছেন। বাদবাকি বিদেশি সুর। মঞ্চের পরিমিতির কথা বললেও লোকনাট্যের ন্যায় উন্মুক্ত চত্বরে পরিবেশনের বিধান রেখে যান নি তিনি, যাকে বলা যায় Open-air opera.[১০]

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীতনির্ভর অভিযাত্রায় প্রতিনিয়ত চলতে চলতে কুড়িয়ে পাওয়া অধরা মাধুরী ছন্দগুলোকে একান্ত মনে সংযুক্ত করতে করতে নানা পথে হেঁটেছেন — শান্তিদেব ঘোষের বিন্যস্ত ছয়টি পর্ব বিভাজন তারই প্রমাণ বহন করে। তবে শান্তিদেব গীতিনাট্যের বিভিন্ন ধরন চিহ্নিত করতে গিয়ে বাংলার লোকনাট্যের কোনো উদাহরণ টানেন নি। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের ছয়টি পর্ব যেহেতু ঐতিহ্যবাহী চারটি ধরনের সাথে মিলে যায় সেহেতু তাঁর চোখ যে লোকসংস্কৃতির নিখুঁত উপাদানকেও এড়িয়ে যায় নি — এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যে কোনো উপাদানকেই আলাদাভাবে দেখার উপায় তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন 'পরিমিতি' 'সংযম' 'রিভিলেশন' 'সংযত' ইত্যাদি শব্দের দৃষ্টান্ত প্রদান করে।

লোকনাট্যের আঙ্গিকে বা খোলামঞ্চে উচ্চৈঃস্বরে অভিনয়ের রেওয়াজ আছে — এই বিষয়টিও তাঁর পরিমিতির বন্ধনে আটকে গেছে। এ দেশের রঙ্গমঞ্চে 'মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য' যে জবরদস্তি প্রয়োগ করা হয় তাকে 'মিথ্যাসাক্ষী'র সাথে তুলনা করেছেন। 'তাহাতে কেবল বাহিরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিবার' সুযোগ পায় না, এমনকি বিষয়ের স্বচ্ছতাকে নষ্ট করে দেয়। বাংলার

নানাবিধ সুরের মধ্যেও তিনি বাছাবাছি করেছেন। সেখানে গৃহীত হয়েছে সরল ও কোমল সুর; আর বেশকিছু তীব্র সুর সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য :

> দেখিয়াছি বাংলায় অনেকগুলি সুর কেমন দেখিতে দেখিতে ইতর হইয়া যায়। আমার বোধ হয় সভ্যদেশে যে যে সুর সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত, তাহার মধ্যে একটা গভীরতা আছে, তাহা তাহাদের National air, তাহাতে তাহাদের জাতীয় আবেগ পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়। যথা Home Sweet Home, Auld lang Syne — বাংলাদেশে সেরূপ সুর কোথায়? এখানকার সাধারণ-প্রচলিত সুরের মধ্যে গাম্ভীর্য নাই, স্থায়িত্ব নাই, ব্যাপকতা নাই। সেই জন্য তাহার কোনোটাকেই National air বলা যায় না।[১১]

এই বক্তব্য থেকেই তাঁর আধুনিকতার স্মারক চিহ্নিত করা যায়। অপেরায় প্রযোজ্য কণ্ঠস্বরের ঐকতানকে অতিরঞ্জিত ভেবে খারিজ করে দেয়ার পেছনেও একই ধরনের ভাবনা থাকতে পারে। লোকনাট্যের কণ্ঠ National air-এর পরিপন্থী বলাটা তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য, আর নাট্যরীতিতে তা ব্যবহার করা আঙ্গিক-সংঘাতের সামিল বলে ধরে নেয়া যায়। তবে উভয়ের মাঝ থেকে শিল্প-সুষমা আহরণ করতেও তিনি ভোলেন নি। অন্তরতর সুর যা মর্মস্থলকে উচ্ছ্বাসময় করে তোলে — সেই অনির্বচনীয় ধারার সন্ধানে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক অভিযাত্রা।

উপরের কথা নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য; অর্থাৎ পাশ্চাত্য 'ব্যালে'র সঙ্গে তাঁর নৃত্যনাট্যের প্রভেদ রয়েছে ঢের। ব্যালে যন্ত্রসংগীতাশ্রয়ী মাধ্যম — যাকে 'নাট্যে অভিনেয় বস্তু বা বিষয়কে নৃত্যের সাহায্যে প্রস্ফুটিত করা হয়।' সেখানে সুর-তাল-ছন্দই নাটকীয়তাকে সহযোগিতা করে।

'ব্যালে'র নাট্যচরিত্রগুলো মুকাভিনয়ের দ্বারা অর্থপ্রকাশ করে। সংলাপ বা গান এতে ব্যবহৃত না হয়ে তার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় কোরিওগ্রাফি। দেহ ভঙ্গিমায় রস প্রকাশের মাধ্যম হলো নৃত্য। ব্যালের বিকাশের পর সেই ধারণা আরো নিখুঁতভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। অভিনয় (মূক) এবং নৃত্য দুই ধরনের সৌকর্য নিয়ে ভাবপ্রকাশে ভিন্ন ধরনের স্পষ্টতা তৈরি করেছে। 'ব্যালে'র মূল শিল্পী নর্তকীকে বলে 'ব্যালেরিনা' আর নর্তককে বলে 'ব্যালেরিনো'।

'ব্যালে'র উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিলে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের আঙ্গিক-স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। ভাস্কর মিত্রের মতে :

> রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের সঙ্গে মূল প্রভেদ এই যে, ব্যালে যন্ত্র-সংগীতাশ্রয়ী রচনা; নৃত্যনাট্যের ভিত্তিভূমি হল গান। অপেরারও প্রকাশের মাধ্যম গান কিন্তু নৃত্যনাট্যে গানের ব্যবহার মঞ্চে আবির্ভূত চরিত্রদের মুখে গীত। নেপথ্যে, ব্যালের যন্ত্রসংগীতের মতন। প্রত্যেকটি চরিত্র তাই এখানে দ্বিধাবিভক্ত : একজন মঞ্চে নৃত্যাভিনয়ের মাধ্যমে তার আনন্দবেদনা ফুটিয়ে তোলেন আর-একজন অন্তরালে থেকে গানের ভিতর দিয়ে তাকে প্রকাশ করেন।[১২]

এছাড়া নৃত্যনাট্যে ব্যালেরিনার মতো গুরুত্বপূর্ণ নৃত্যশিল্পীর ভূমিকায় কেউ থাকে না। গান হলেও সেখানে অর্কেস্ট্রার ন্যায় বাদ্যযন্ত্র রাখা যেত, রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে যন্ত্রের ব্যবহারও সেই তুলনায় লঘু।

পাশ্চাত্যেও ব্যালে ও অপেরার মিশ্রণে কিছু নৃত্যনাট্য চর্চা হয়েছে। সে সম্পর্কে বলা যায় :

> Singers were grouped at the sides of the stage, while dancers mimed the action — each character being represented by the singer and dancer.[১৩]

সতের শতকের শেষে এবং আঠারো শতকের শুরুতে ইউরোপে অপেরা-ব্যালে নামে একটি মিশ্রধারা প্রতিষ্ঠা পায়; অবশ্য ভাস্কর মিত্র বলছেন অন্য কথা। তাঁর মতে :

> ১৯১৪ সালে অপেরা-ব্যালে সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হয়। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের রূপের সঙ্গে এই অপেরা-ব্যালের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। ব্যালের সম্মেলক নৃত্যছন্দের মধ্যে যে দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ রচিত হয়, রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে সখীদের অথবা নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত 'মায়ার খেলা'য় মায়া কুমারীদের আবির্ভাবে তেমনই দৃশ্যরচনার অভিপ্রায় থাকাও অসম্ভব নয়।[১৪]

সাধারণ নৃত্য অপেক্ষা নৃত্যনাট্যের পার্থক্য হলো, নৃত্যাভিনয়ের দক্ষতা প্রদর্শনের পরিবর্তে নাট্যের অভ্যন্তরীণ দর্শনকে নাচের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা এর মূল উদ্দেশ্য।

ব্যালের নৃত্যকৌশল ধীরে ধীরে উন্নত হয়ে এখন শরীরের সূক্ষ্ম ও পরিশ্রমনির্ভর বিশেষ পদ্ধতিতে রূপ নিয়েছে। যেমন ১৬ শতকের দিকে ব্যালের সময় জমকালো পোশাক, পরচুলা, উঁচু জুতো ব্যবহৃত হতো। ১৮ শতকে এর সাথে শারীরিক কসরত যুক্ত হয় — অর্থাৎ পায়ের বুড়ো আঙুলের মাথায় ভর করে নাচের রেওয়াজ চালু হয়। 'রোমান্টিক যুগে (১৮২৭-১৯০০) ব্যালেতে একপ্রকার অপ্রথাবদ্ধতা যুক্ত হয়, সৌন্দর্য রচনার প্রয়াসে অনেক আটঘাট নিয়মে শৈথিল্য দেখা দেয়। পোষাকটি খাটো হয়ে এক পর্যায়ে স্কিন-টাইট পোষাক চালু হয়।'[১৫]

রবীন্দ্রনাথও নৃত্যনাট্যে এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন — তবে তা ভারতীয় নৃত্যের বিভিন্ন আঙ্গিককে উদার অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে। যেমন, ১৯২৬ সালে *নটীর পূজায়* মণিপুরী নৃত্য এবং ১৯৩১ সালে কথাকলি নৃত্যের সংযোজন; ১৯৩৬ সালে *চিত্রাঙ্গদায়* মণিপুরী নৃত্য ব্যবহার করলেও পরবর্তীকালে কথাকলি ও লোকনৃত্য এবং ১৯৩৮ সালে *শ্যামা* নৃত্যনাট্যে প্রথমবারের মতো কত্থক নৃত্য ব্যবহার করেন। অর্থাৎ কোনো ধরনের নাচই রবীন্দ্রনাথের কাছে পরিত্যাজ্য ছিল না। নৃত্যমুদ্রার বা ভঙ্গিমার মধ্যে যে ভাব ও চিত্রের প্রকাশ, তা নিজের সৃষ্টিকর্মের সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন মাত্র। শিল্পের আঙ্গিক প্রতিষ্ঠা না করে শিল্পের আনন্দ প্রকাশই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে বলে গ্রহণ-বর্জনের খেলায় মেতে উঠতে কোনোও দ্বিধা জাগে নি।

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন নৃত্য চর্চার অধোগতি ও বিচ্ছিন্নতা। সংগীতের অনুগামী করে তাকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্য তাঁর মনে উঁকি দিয়েছিল হয়তো। তবে অভিপ্রায় এ রকম নয় যে, নর্তক বা নর্তকী সৃষ্টি করাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল; বরং নৃত্যকলাকে তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। মানুষের মনের মহৎ আনন্দের স্মারক হিসেবে নৃত্যকলা শিক্ষাকে চিরজাগ্রত রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। নৃত্যকে শুধুই নৃত্য হিসেবে দেখা নয়, অথবা ব্যালের মতো নৃত্যকুশল দক্ষতা প্রদর্শনের মতোও নয়, তিনি চেয়েছিলেন সংগীতের

সাথে নৃত্য জড়িয়ে থাক অনন্তকাল, ভাইবোনের মতো। এ কারণেই শেষ বয়সে হলেও শান্তিনিকেতনে নৃত্যশিক্ষার পাঠ উন্মুক্ত করেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিদেব ঘোষ এ সম্পর্কে বলেন :

> শান্তিনিকেতনে নাচের শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা কেবল নাচিয়ে তৈরি করা গুরুদেবের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান ও অন্যান্য কলাবিদ্যা সমাজজীবনকে যেমন উন্নত শান্তিময় করে তোলে, নৃত্যকলাও যেন তাই করে।[১৬]

বাংলাদেশে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যচর্চা এবং তার প্রযোজনা পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক কম হয়। যতটুকু হয়, তার মানের বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ। সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রভাবনা বিকাশে কিছুটা হলেও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে এ দেশে। রবীন্দ্রচর্চায় সৌন্দর্যবোধের মাপকাঠিতে সেই অভাব অনুধাবন করা যায়। এ দেশের নৃত্য ও নাট্যদলগুলোর কেউ কেউ সাহস করে এ বিষয়ক চর্চায় মনোনিবেশ করলেও সংগীতবিষয়ক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এ ধরনের উদ্যোগের অভাব রয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতের রসবিতানে খরিদ্দার হতে চাইলে, নাট্যধারা সম্পর্কে তার সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অন্য কোনো শাখায় না হোক, রবীন্দ্রসংগীতের সাথে নৃত্য ও নাট্যের সম্পৃক্ততা বিষয়টি অনুধাবন করা অপরিহার্য। নাটক দিয়ে যিনি সংগীত সাধনার সূচনা করেন, শেষান্তেও নাটক ও নৃত্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁকে শুধু গানের সুর ও স্বরলিপি দিয়ে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাঁর ভাবদর্শন ও সৌন্দর্যবোধের চর্চা যথার্থ অর্থে না করলে, রবীন্দ্রসংগীত চর্চা এবং শিল্পী সৃজনে এখনও আমাদের ভেতর যে সংকট কাজ করে যাচ্ছে, তা থেকে ভবিষ্যতেও মুক্তি নেই।

তথ্যনির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, বিশ্বভারতী সংগীত-সমিতির পক্ষে প্রথম প্রকাশ, ১৩৯৩, পৃ. ১০-১১

২. প্রণয়কুমার কুণ্ডু, 'রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য', সুচিত্রা মিত্র ও সুভাষ চৌধুরী সম্পাদিত *রবীন্দ্রসংগীতায়ন*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৭৬

৩. Roger kamien, *Music an Apreciation,* McGraw-Hill, International edition 1992, P. 149

৪. সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ,* শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্র, ঢাকা, পৃ. ১২১

৫. শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্রসঙ্গীত,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা ১৪১৫, পৃ. ১৯০

৬. সেকালে প্রদর্শিত ৫০ টি অপেরাঘেঁষা নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম — অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শকুন্তলা গীতাভিনয়' (১৮৬৫), মাইকেলের 'পদ্মাবতী' (১৮৬৫), হরিমোহন রায়ের 'রত্নাবলী গীতাভিনয়' (১৮৬৫), পূর্ণচন্দ্র শর্মার 'শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান' (১৮৬৬), তিন কড়ি ঘোষালের 'সাবিত্রী সত্যবান গীতাভিনয়' (১৮৬৭), যাদবচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'কিচকবধ নাটক' (১৮৬৭), শ্রীশ চৌধুরীর 'লক্ষণ বর্জন নাটক' (১৮৭০), হরিশচন্দ্র মিত্রের 'আগমনী' (১৮৭০), উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সারোজিনী' (১৮৭৪), অন্নদাচরণের 'উষাহরণ গীতাভিনয়', হরিমোহন রায়ের 'মানিনী' (১৮৭৫) ইত্যাদি।

৭. করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০৪, পৃ. ৭৮৮

৮. The Basic voice ranges (soprano, alto, tenor, bass) are divided more finely in opera. some of the *voice categories of opera* are as follows : a. *Coloratura soprano* — (Very high range; can executive rapid scales and trills), b. *Lyric*

soprano — (Rather light voice; sings roles calling for grace and charm), c. *Dramatic Soprano* — (Full, powerful voice; is capable of passionate intensity), d. *lyric tenor* — (Relatively light, bright voice), e. *Dramatic tenor* — (Powerful voice; is capable of heroic expression), f. *Basso buffo* — (Takes comic roles; can sing very rapidly, g. *Basso profundo* — (Very low range, powerful voice; takes roles calling for great dignity. Roger Kamien, *Music an Appreciation,* McGraw-Hill, International edition 1992, P. 147

৯. প্রণয়কুমার কুণ্ডু, 'রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য', সুচিত্রা মিত্র ও সুভাষ চৌধুরী সম্পাদিত *রবীন্দ্রসংগীতায়ন*, পৃ. ৮০

১০. 'Open air opera has been popular in our country for a long time. This treatise is not meant for detail study. Some expertise inclined to go beyond the Vedic age to seek the roots of this kind of open air opera. Joy (Geet) Gobinda of Joydev of the 12th century is identified as the origin in written form of the songs of open-air Opera. Momotazuddin Ahmed, *'Practice of Jatra: the crisis and Development.* Jatra our Heritage, Bangladesh shilpokala academy, Dhaka 2000, P.78

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, পৃ. ২২১-২২২

১২. সুচিত্রা মিত্র ও সুভাষ চৌধুরী সম্পাদিত, *রবীন্দ্রসংগীতায়ন*, পৃ. ৩২

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১৫. করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০৪, পৃ. ৪০২

১৬. শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্রসঙ্গীত*, পৃ. ১৪৮